খাদ্য কথন

টাকা হিসেবে ব্যবহার হতো চকলেট...

চকলেট কথাটি শুনলেই স্মৃতি হয় শৈশবমুখী। ছোটবেলায় চকলেট বলতে বুঝতাম চার আনা করে রঙিন কাগজে মোড়ানো মুঠো ভর্তি লজেন্স। এক মুঠো চকলেট কেনা ছিল তখন ঈদের খুশির মতো। শৈশব পেরুতেই আরও হরেক রকম চকলেটের সঙ্গে পরিচয়। আর এই বড়বেলায় এসে দেখছি বিশ্বজুড়ে কত পদের নামিদামি ব্র্যান্ডের চকলেটের ছড়াছড়ি। প্রতিবেদন **হাসান নীল**

কোকো গাছ থেকে উৎপত্তি

অপ্রিয় হলেও সত্যি, চকলেট খেতে আমরা যতটা আগ্রহী এর ইতিহাস জানতে ততটা আগ্রহ দেখাই না। কীভাবে উৎপত্তি হলো চকলেটের তা-ও জানি না। কোকো নামের এক প্রজাতির গাছ রয়েছে। এই গাছের ফল থেকে চকলেট তৈরি করা হয়। গাছগুলো পাওয়া যায় মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়। ফলগুলো হয় গুটি আকারের। একটিতে ৪০টি কোয়া থাকে। ছোট ছোট এই কোয়াগুলো পুড়িয়ে তৈরি করা হয় কোকো বিন।

ইতিহাস

চকলেটের ইতিহাস মোটেও পরিষ্কার না। কবে কীভাবে চকলেটের উদ্ভব, তা বলতে পারে না কেউ। এর মাঝেও আশার সলতে জ্বালিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্মিথসোনিয়ার ন্যাশনাল মিউজিয়ামের কালচারাল আর্ট কিউরেটর হায়েস লেভিস। চকলেট সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। ভদ্রলোক জানিয়েছেন, খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকেই প্রাচীন ওলমেক সভ্যতার মানুষেরা নৌযান ভরে কোকো ফল নিয়ে আসতেন। যদিও চকলেটের ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি মতবাদ রয়েছে। একেকজন একেক মতে বিশ্বাসী। কেউ মনে করেন, ওলমেকরা শুধু তরল পদার্থ হিসেবে কোকো দিন পান করত। কারও মতে উৎসবের দিনগুলোতে কোকো বিন দিয়ে বিশেষ পানীয় বানানো হতো।

সে যাই হোক চকলেটের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত মায়া সভ্যতা। কেননা ওলমেক সভ্যতায় পাওয়া গেলেও এর বিস্তার ঘটে মায়া সভ্যতায়। এরকমই মনে করেন ইতিহাসবিদগণ। এ সভ্যতায়ও আজটেক সভ্যতার মতো চকলেট পেত বিশেষ মর্যাদা। এই যেমন বড় কোনো অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পানীয় হিসেবে পরিবেশন করা হতো। তবে আজটেকের মতো বৈষম্যের প্রতীক করে রাখা হয়নি। উচ্চবিত্তদের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর হাতে নাগালেও এতটাই ছিল যে এ সভ্যতায় কেউ কেউ তিন বেলা চকলেট খেত। এ সময় চকলেট ছিল নরম ও ঘন। অনেক সময় এর সঙ্গে মরিচ মেশানোও থাকত।

ছিল মর্যাদার প্রতীক

একটা সময় চকলেটকে খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি দেখা হতো বিশেষ মর্যাদার চোখে। এই মর্যাদার দিনগুলো ছিল অ্যাজটেক সভ্যতায়। ১৮৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই সভ্যতা। সেসময় মানুষ মনে করত চকলেট ঐশ্বরিক উপহার। সেকারণেই করা হতো বিশেষ মান্যিগণ্যি। পাশাপাশি পেয়েছিল অর্থের মর্যাদা। ব্যবহৃত হতো মুদ্রা হিসেবে। বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনার সময় ব্যবহার করা হতো। মর্যাদা দিক থেকে অ্যাজটেক সভ্যতাকে চকলেটের স্বর্ণযুগ বললেও ভুল হবে না। এতটাই মূল্যায়ন করা হতো যে স্বর্ণের চেয়ে দামি মনে করা হতো। খাবার সময়ও নেওয়া হতো বিশেষ যত্ন। সুসজ্জিত পাত্রে গরম ও ঠান্ডা ক্যাফেইন, স্পাইসড চকলেট পানীয় পান করা হতো। সরিয়ে রাখা হয়েছিল জনসাধারণের নাগাল থেকেও। সম্ভ্রান্তদের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হতো। শুধু বিয়ে কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিম্নবিত্তদের মাঝেমধ্যে চকলেটের স্বাদ চেখে দেখার ভাগ্য হতো।

শুধু স্বর্ণযুগ না, অ্যাজটেক সভ্যতাকে চকলেটের সৌভাগ্যের সময়ও বলা যায়। এত কিছুর পাশাপাশি বলবর্ধক হিসেবেও ভাবা হতো চকলেটকে। এই বিশ্বাস ছিল শাসক দ্বিতীয় মন্টেজুমারের। তিনি ছিলেন ওই সভ্যতার এক দাপুটে শাসক। ভয়াবহ রকম চকলেটপ্রেমী ছিলেন। খেতে এতটাই পছন্দ করতেন যে চকলেট খাদক হিসেবে কুখ্যাতি ছিল। সে সময় ধারণা করা হতো শক্তিমান ও বীর্যবান করার অন্যতম উপাদান এই চকলেট। তাই তিনি যেমন প্রতিদিন গ্যালন ভর্তি চকলেট পান করতেন তেমনই নিজের সেনাবাহিনীর জন্য কোকো বীন সংরক্ষণ করতেন।

উৎপাদনে বিপ্লব

চকলেট নিয়ে মারাত্মক মাতামাতি চলে পশ্চিমা বিশ্বে। যেকোনো উপলক্ষ্যেই তারা কেনেন চকলেট। তবে সেখানে চকলেটের আগমন কিন্তু বেশ পরে। ১৮ শতকের দিকে ইউরোপে প্রথম চকলেট আগমন। সে সময় এটি ছিল ভীষণ দামী এবং বিলাসিতার প্রতীক। যতটা দূরত্বে থাকলে ধরাছোঁয়ার বাইরে বিবেচনা করা হয় সাধারণ মানুষের সঙ্গে তখন তেমনই সম্পর্ক ছিল চকলেটের। ধনী ব্যক্তিরা এর স্বাদ নিয়ে সৌখিনতার পরিচয় দিতেন। ওই সময় চকলেট উৎপাদনেও ঘটে বিপ্লব। এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ডাচ রসায়নবিদ কোয়েনরাড জোহানেস ভ্যান হাউটেনে। তিনি লবণের ক্ষারের সঙ্গে কোকো বিন মিশিয়ে এক ধরনের পাউডার চকলেট উদ্ভাবন করেন, যেটি খুব সহজেই পানিতে মিশিয়ে পান করা যেত। এভাবে চকলেট

উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে ডাচ্স প্রসেসিং বলা হতো। আর এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন চকলেটকে ডাকা হতো ডাচ কোকো নামে।

অনেকে মনে করতেন কোকো প্রেসের আবিষ্কারক ও ভ্যান হাউটেন। তবে এ নিয়ে কিন্তু রয়েছে বিস্তর মতভেদ। কারও মতে এটি ভ্যানের বাবার সৃষ্টি। তিনিই মূলত কোকো প্রেসের আবিষ্কারক। তবে আবিষ্কারক যিনিই হন না কেন চকলেটের বিস্তারে কোকো প্রেস প্রক্রিয়াটি দারুন কাজে লেগেছিল। উৎপাদন খুব সহজ করে দিয়েছিল এবং সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে নিয়ে এসেছিল। কেননা কোকো প্রেসের মাধ্যমে রোস্টেড কোকো বিনগুলো থেকে কোকো বাটার আলাদা করা হতো। এভাবে খুব সহজেই কোকো থেকে পাউডার বানানো যেত। ফলে চকলেট বানানোর সহজ হয়ে পড়ে। এর প্রভাব ঘটে চকলেটের বিস্তারে। নানা ধরনের চকলেট তৈরি হতে থাকে। ডাচ প্রসেসিং ও চকলেট প্রেস-ই মূলত চকলেট উৎপাদন মূলত সহজ করে তুলেছিল।

সময়ের সঙ্গে রূপ পাল্টেছে

চকলেটের কখনও ঐশ্বরিক উপহার হিসেবে ভাবা হয়েছে, কখনও ব্যবহৃত হয়েছে অর্থের বিকল্প হিসেবে। আবার কখনও মহামূল্যবান পানীয় হিসেবে জায়গা নিয়েছে বিত্তবানের খাবার টেবিলে। কখনও জনসাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেছে। বোঝা যায় গল্পটা বেশ বর্ণিল। চকলেটের ধরনও বদলেছে সময়ের সঙ্গে। আজকাল মুখে পুরে চিবিয়ে কিংবা চুষে খাওয়া হলেও এক সময় এরকম ছিল না। শুধু পানীয় হিসেবে পান করা হতো। কখনও পানি কখনও দুধ মিশিয়ে পান করা হতো। পরিবর্তন আসে ১৮৪৭ সালে। সে বছর থেকে পানীয়ের পরিবর্তে চকলেটের বার তৈরি শুরু হয়। ব্রিটিশ চকলেট কোম্পানি জেএস ফ্রাই অ্যান্ড সনস প্রথমবার এই উদ্যোগ নিয়েছিল। তারা চিনি, তরল চকলেট ও কোকো বাটার মিশিয়ে এই চকলেট বার উৎপাদন করা শুরু করে। তখনও নেসলে চকলেট কোম্পানি গড়ে ওঠেনি। এটি গড়ে তুলেছিলেন ড্যানিয়েল পিটার ও হেনরি নেসলে নামের দুই বন্ধু। যদিও এর আগে থেকেই চকলেট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন সুইস ড্যানিয়েল পিটার। ১৮৭৬ সালে তিনি চকলেটের সঙ্গে দুধের গুঁড়া মিশিয়ে মিল্ক চকলেট উৎপাদন করেন। আগেই বলেছি চকলেটের পথচলাটা বৈচিত্র্যপূর্ণ। শুরু দিকে তরল হিসেবে পরিবেশন করা হতো। এরপর তা বারে রূপ নেয়। তবে সে সময় তা ছিল ভীষণ শক্ত। চুষেও খাওয়া যেত না। এ অবস্থার উত্তরণ ঘটান সুইস চকলেট ব্যবসায়ী রুডলফ লিন্ড। তিনি একটি মেশিন উদ্ভাবন করেন। যেটি এমনভাবে মিশ্রণ ঘটাতো যে চকলেট শক্ত হওয়ার পরিবর্তে মসৃণ নরম ও কোমল হয়ে উঠত। ১৮৭৯ সালের ঘটনা এটি।

আমেরিকায় আগমন

এবার জানব আমেরিকায় কীভাবে আগমন ঘটল চকলেটের। প্রথম আনা হয় ১৬৪১ সালে। সে বছর একটি স্প্যানিশ জাহাজে করে ফ্লোরিডায় চকলেট আনা হয়। দেশটিতে চকলেটের বাজার শুরু ১৬৮২ সালে। বোস্টনে প্রথম আমেরিকান চকলেট হাউস চালু করা হয়। এর প্রায় ১০০ বছর পর ১৭৭৩ সালে আমেরিকায় কোকো বিনের আমদানি করা হয়। সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে সহজলভ্য হয়ে পড়ে চকলেট। ধীরে ধীরে তা নিয়মিত খাবার হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। ১৭৭৫ সালে যুদ্ধক্ষেত্রেও চকলেটের ব্যবহার শুরু হয়। সে বছর থেকে আমেরিকান সামরিক বাহিনীর রেশনে চকলেট যুক্ত হয় এবং তাদের বেতনের টাকার বদলেও চকলেট দেওয়া হতো।

ইউরোপে আগমন

ইউরোপে কখন চকলেটের আগমন ঘটেছে এ নিয়ে একমত হতে পারেননি গবেষকরা। নানা মুনির নানা মত। তবে একটি জায়গায় ঠিকই এক হয়েছেন তারা। সেটি হচ্ছে ইউরোপের প্রথম যে দেশটিতে চকলেটের আবির্ভাব ঘটে সেটি হচ্ছে স্পেন। প্রশ্ন হলো কীভাবে দেশটিতে চকলেটের আগমন ঘটল? কেউ মনে করেন, এটি ১৫০২ সালের ঘটনা। আমেরিকার আবিষ্কারক কলম্বাসের কীর্তি। তিনি আমেরিকা পাড়ি দেওয়ার সময় কোকো বিন পান এবং ফেরার সময় সঙ্গে করে স্পেনে আনেন। আবার কেউ মনে করেন কলম্বাস না স্পেনে কোকোবিন আগমনের সঙ্গে নাম জড়িয়ে আছে স্প্যানিশ বীর হারনান কার্টেজের। হারনানের সম্পর্কে বলা হয় তিনি এই চকলেটের খোঁজেই অ্যাজটেকে মন্টেজুমারের দরবারে গিয়েছিলেন। আর সেখান থেকে সঙ্গে করে নিয়েই দেশে ফিরেছিলেন। এটিও বিশ্বাস করেন না অনেকে। তারা মনে করেন, ১৫৪৪ সালে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ গুয়াতেমালান মায়া ভিক্ষুদের কাছ থেকে কোকো বিন উপহার পেয়েছিলেন। যাই হোক স্পেনে আসার পর চকলেট ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয়নি। কেননা স্পেনের পার্শ্ববর্তী ফ্রান্স ও ইতালি থেকে যারা আমেরিকা ভ্রমণ করতেন তারা ফেরার সময় কোকো বিন সঙ্গে করে আনতে ভুলতেন না। পাশাপাশি স্পেন ও চকলেট আমদানি শুরু করে ১৫৮৫ সালে। আর এভাবেই ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে চকলেট।

কেন এত জনপ্রিয়

শেষ করব চকলেট কেন এত জনপ্রিয় সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে। ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব লিডসের একদল বিজ্ঞানীর গবেষণায় উঠে এসেছে, চকলেট রয়েছে চর্বি। মুখে পড়লে এই চর্বি ভেতরে একটি পাতলা আবরণ তৈরি করে। সেই আবরণের কারণে মুখের ভেতর এক ধরনের কোমল অনুভূতি তৈরি হয়। সঙ্গে যোগায় চকলেটে থাকা বিভিন্ন উপাদান এবং মুখের লালা। সব মিলেমিশে দারুণ এক অনুভূতি তৈরি হয়। একবার খেলেও জিভের স্বাদ ঠিকই লেগে থাকে। আবারও খেতে মন চায়। এ কারণেই চকলেট এত জনপ্রিয়।